?????????? ??? ??????

প্রায় একটি বছর কেটে গেলো হঠাৎ সেদিন মেয়েটি আমাকে ফোন করে বলছে কেমন আছেন? ভেবেছিলাম সুদ্রাবে ভুলগুলো কিন্তু এ যে সে জাতি নয়, ভাংবে তবু মচকাবে না। আমি বুঝতে পারছিলাম না সত্যিই কি মারিয়া আমাকে ফোন করেছে। আমি বললাম ভালো আছি সোনা তুমি কেমন আছো। ও বললো ভালো আছি তা প্রেম ট্রেম কেমন চলছে জানতে পারি।

ভাবলাম আমার স্বার্থপর মেয়েটা মনে হয় আমার প্রেমের মর্মটা অবশেষে বুঝলো তাই আমার খোজ খবর নিচ্ছে। বললাম সোনারে আমাকে তো ভালোবাসলে না তবে হঠাৎ এই প্রশ্ন করছো যে। ওর লাইফ ইসটাইল কেমন পরিবর্তন করেছে তা জানিনা তবে আমার কথার মাঝে অন্য রকম রসগোল্লা ঢালতে সিখেছি বিরহের অবসরে। ও বললো না এমনিতেই অনেক দিন কোনো খোজ খবর তো নিলেন না তাই আমিই খোজ খবর নিলাম।আসোলে ও আমাকে কোনোদিন পাত্তাই দেয় নি তাই পুরোনো কথা না উঠিয়ে আমি বললাম সূর্যকে কখনই আরাল করে কেও রাস্তায় চলতে পারে না। তেমনি আমিও তোমাকে আড়াল করে চলতে পারি নাই। যে প্রেম জীবনের সূচনায় সে প্রেম যে ভোলাটা বড়ই দায়। আমাকে বলবে কি যে কেমন করে ভুলবো তোমায় সোনা পাখি। স্বার্থপর মেয়েটা এখন হারে হারে বুঝতে পারছে রাফি আর আগের রাফি নেই। রাফি এখন আর কথার কাঙ্গাল নেই। ও বললো আপনি তো অনেক সুন্দর করে কথা বলা সিখেছেন। আমি বললাম তাই নাকি রাজাকে তার মাথার মুকুট পরলে তাকে সুন্দর দেখায় তাহলে আমাকে কথার মুকুট পরিয়ে দাও না প্রিয়। ও এক দিকে সোনা পাখি, প্রিয়, সোনারে কথাগুলো সুনে বিরক্ত অনুভুত হলেও এত সুন্দর করে ওর কোন বয়ফ্রেন্ড যে ওর সাথে কোনদিন কথা বলে নি সেটা নিশ্চিত ছিলাম। তাই ও কিছু না বলে শুনছিলো আর কথা বলছিলো। আমি বললাম তোমাকে নিয়ে আমার একটা আশা ছিলো বলবো। বলেন। এক বছর পর তোমার সাথে কথা বলছি তাই এটা রাখতে হবে। চেষ্টা করবো। আমি তোমাকে বাবু বলে ডাকবো। কেনো আমি কি আপনার জিএফ নাকি। প্লিজ আগের রুপটা দেখিও না রাজকুমারী। হেসে দিয়ে বললো এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ী হচ্ছে। আমি বললাম আমার দুষ্টু বাবুটা দুষ্টুমি ছাড়া কিচ্ছু বুঝেনা।

আমিঃ বাবু কখনো সাতটি রং একসাথে দেখেছো?

মারিয়াঃ রং পেনছিল দিয়ে কত রং একেছি।

আ- মনের রং দেখেছো

মা- কিভাবে সেটা দেখা যায় নাকি

আ- যে নিস্বার্থ ভাবে ভালোবাসতে যানে সে একসাথে সাতটি রং দেখতে পায়।

মা- আপনি দেখেছেন তাহলে মনেহয় তাইনা?

আ- ময়ুর হয়ে কখনো নেচে দেখেছো?

মা- আমাকে আজগুবি কথা বলবেন নাতো বিরক্ত লাগছে।

আ- তাহলে সিগারেটের ধোয়ার কাওকে পুরতে দেখেছো?

মা- বললাম না ভালোমত কথা বললে বলেন নাহলে ফোন কেটে দিব। আপনি হয়ত যানেন না যে আমি আমার ছোট বোনকে এটা বোঝানোর জন্য ফোন করেছি।

আ- মানে কি?

মা- মানে ওর সন্দেহ ছিলো যে আমি আপনার সাথে প্রেম করি সেটা ভুল ধারনা ভাঙ্গালাম।

আ- ভালো তুমি সত্যি অনেক মজার মেয়ে। আমি তোমাকে সুধোসুধি ভুল বুঝতাম। তুমি সত্যি অনেক ভালো মেয়ে। আজকে আমি অনেক খুশি তোমার উপর সোনা।

মা- কি বলেন পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

আ- আমার রুপ আমি বদলাই না।

মা- তাহলে আমি এমন কি করলাম যে আমাকে এত ভালো জানা হচ্ছে।

আ- ফুল গাছেই সুন্দর মানায়।

মা- আমি কিছু বুঝলাম না এত দিন না করলে বলতেন কষ্ট পেয়েছি আর আজ উলটা খুশি হলেন।

আ- এর জন্য খুশি লাগছে যার সাথে প্রেম করেছো এতদিন সে একটা গাধা আর তুমি বড় গাধা। কারন তুমি প্রেমের মর্ম বুঝইনা। যে অন্যের প্রেমের মূল্য দিতে যানে না সে তো প্রেম বুঝেই না। তোমাকে এর জন্যই বাবু বলে ডেকেছি। ওরে আমার সোনা বাবুটা যে কবে বড় হবে।

স্বার্থপর মেয়েটা কিছুতেই আমাকে ঠকাতে পারছে না মানে আমাকে রাগাতে পারছে না। তাই সে রেগে মেগে বললো আমার সাথে প্রেম করবেন।

আ- তোমার সাথে প্রেম করবো মরতে।

আমি বুঝতে পারলাম আমাকে ঠকাতে চায়। তাই মেয়েদের নিয়ে খেলা করা জলন্ত আগুনের উপর দাড়াইয়া থাকা সমান।

অবশেষে মারিয়া ওর স্বার্থের বিনিময়ে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে আমার মিষ্টি কথার ফাকায় পরে গিয়েছে। একবার ভালোবাসার চাপে সব হারাতে হবে। এভাবে মারিয়া আমার জীবনে জীদ করে আসে আর এই রাগকে দমন করার কৌশল শিখে ওকে সত্যিকারের ভালোবাসতে শিখাতে পেরেছি। তাই এত কিছুর পর আমার প্রেম হওয়ার পর মারিয়াকে ভালোবেশে বলি স্বার্থপর মেয়ে। জানিনা আবার জানি কখন কোন ছলনার স্বিকার হতে হয়। আমি ওকে ওনেক ভালোবাসি তাই ওকে ওর মত থাকতে দিয়েছিলাম বলে অবসেষে আমার কাছেই ওকে ফিরে পেলাম।

?????????? ??????????

কোন এক বসন্তের প্রাণবন্ত সকাল। অনির্দিষ্টের মতো ছেলেটা একটা শপিং কমপ্লেক্সের ভিতর এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকে। একসময় তার চোখ পড়ে যায় একটা CD-স্টোরের কাউন্টারে দাঁড়ানো খুব সুন্দর একটা মেয়ের দিকে। মেয়ের হাসিটা ছিল অপূর্ব রকমের সুন্দর , ছেলেটা প্রথম দেখায় মেয়েটার প্রেমে পড়ে যায়। এটাই মনে হয়, Love At First Sight.

ছেলেটা সামনে এগিয়ে একটা CD নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দেয়।

ছেলেটা: "আমি এই CD-টা কিনতে চাচ্ছিলাম।"

মেয়েটা: (হাসিমুখে) "তুমি চাইলে আমি এটা তোমার জন্য সুন্দর দেখে একটা প্যাকেটে Wrapping করে দিতে পারি।"

ছেলেটা মাথা নিচু করে সম্মতি জানায়।

মেয়েটা কিছুক্ষনের মধ্যে শপ-এর ভিতর থেকে CD-টা Wrapping করে নিয়ে আসে। ছেলেটা CD-টা নিয়ে বাসায় চলে যায়। এরপর থেকে ছেলেটা প্রতিদিন CD-শপে এসে একটা করে CD কিনতে থাকে। মেয়েটা আগের মতোই তা Wrapping করে দেয়। ছেলেটা Wrapping করা CD নিয়ে গিয়ে বাসায় তার সেল্ফ-এ রেখে দেয়। ছেলেটা অনেক চেষ্টা করে মেয়েটাকে তার ভালোলাগার কথা বলার, কিন্তু তা বলতে পারে না। ছেলেটার মা একসময় বিষয়টা জানতে পারে। তখন তিনি তার ছেলেকে পরামর্শ দেন সাহস করে মুখ ফুটে একবার কথাটা বলে দেখতে।

পরদিন ছেলেটা আবার CD-শপে যায়। প্রতিদিনের মতো সে আজও একটা CD কেনে। ছেলেটা ভালোলাগার কথা বলার চেষ্টা করে এবং আজও ব্যর্থ হয়। মেয়েটা CD-টা Wrapping করার জন্য ভিতরে চলে যায়। এমন সময় ছেলেটার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলা করে। সে সাথে সাথে একটা কাগজের মধ্যে লিখে, "*কেন জানি তোমাকে আমার অসম্ভব রকমের ভালো লেগে গেছে। আমরা কি আগামি পরশুদিন বিকালে কফিশপে দেখা করতে পারি।*" লেখাটার নিচে সে তার নাম ও ফোন নাম্বার লিখে রাখে। এরপর কাগজটা মেয়েটার ডেস্কের উপর রেখে ছেলেটা দৌড়ে চলে যায় CD-শপ থেকে।

পরশুদিন বিকাল। এক ঘন্টা ধরে মেয়েটা কফিশপে অপেক্ষা করছে ছেলেটার জন্য। ছেলেটার অনুপস্থিতি দেখে একসময় মেয়েটা ডায়াল করে ছেলেটার ফোন নাম্বারে। ছেলেটার মা ফোন রিসিভ করে।

– "হ্যালো"

— "জন আছে? ওকে একটু দেওয়া যাবে?"

– "কে বলছো তুমি?"

— "আমি মারিয়া"

– "মারিয়া, তুমি কি জান না 'জন' গতকাল রোড অ্যাক্সিডেন্টে ....."

ছেলেটার মা আর কথা কমপ্লিট করতে পারেন না, তার দুইচোখ বেয়ে কান্না চলে আসে। তিনি ধীরে ধীরে তার মৃত ছেলের রুমে

যান। একসময় তার চোখ পড়ে যায় ছেলেটার সেল্ফ-এর উপর সাজিয়ে রাখা অসংখ্য Wrapping করা CD-এর উপর। তিনি অবাক হয়ে দেখেন যে একটা CD-ও Wrapping করা অবস্থা থেকে খোলা হয়নি।

তিনি একটা CD হাতে নিয়ে Unwrapped করেন CD-এর ভিতর একটা কাগজ খুঁজে পান তিনি। তাতে লেখা আছে, *"কেন জানি তোমাকে আমার অসম্ভব রকমের ভালো লেগে গেছে। আমরা কি কোন একদিন বিকালে কফিশপে দেখা করতে পারি – 'মারিয়া'।*

"

সাথে সাথে তিনি আর একটা CD হাতে নিয়ে Unwrapped করেন। আবার এই CD-এর ভিতরেও তিনি আর একটা কাগজ খুঁজে পান। তাতে লেখা আছে, *"কেন জানি তোমাকে আমার অসম্ভব রকমের ভালো লেগে গেছে। আমরা কি কোন একদিন বিকালে কফিশপে দেখা করতে পারি – 'মারিয়া'।"*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সকালটা শুরু হল এই ভাবে। ডিং ডিং ডিং…। বেজেই চলেছে অ্যালার্ম। ঘরের ভেতর আধো অন্ধকার। হালকা আকাশি মশারি। সে ঘুমন্ত অবস্থাতেই কম্বলের ভেতর থেকে হাত বার করে অ্যালার্ম স্টপ করে। ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখে, লম্বা সিল্কের পর্দার ফাঁক দিয়ে ভারি ম্রিয়মাণ একটা আলো ঢুকছে। হতক্লান্ত দুটো মশা তখনও মশারির চালে বসে হুল ফোটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। -ধেৎ! সে আবার কম্বল দিয়ে মাথা ঢাকে। আর সমানে নিজেকে বলতে থাকে, আটটায় ওঠার জন্য কেউ অ্যালার্ম দেয়? এই মেয়েটা, বল্ বল্, কেউ অ্যালার্ম দেয়?

এরপরেও তার কম্বল এক চিলতে সরেনা। কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করে না। অথচ শান্তিতে শুতেও পারেনা। অপরাধ বোধ

খামচাতে থাকে। -'মনে আছে কিছুদিন আগেও সাতটার সময় গিয়ে স্কুলের খাতায় সাইন করতিস?'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সে রাগ করে।– যখন যেমন তখন তেমন ভাই। এখন আমি উঠতে পারছি না। বেশ করবো, ন'টা দশ'টা অব্দি ঘুমবো।

না, 'বেশ' করাটা আর তার হল না। এবার ডোর বেল। ঘুমের মায়া জাল ছিন্ন করে তারস্বরে বাজতে থাকে। শম্পা! দু'মিনিটের মধ্যে না খুললে, শম্পা উল্টো দিকে হাঁটা মারবে। নাহ, এ ঘটনা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যাবে না। মনে প্রচুর জোর এনে এক ঝটকায় কম্বলের বাইরে এসে চাদর জড়িয়ে হুড়মুড় করে সে দরজা খুলতে দৌড়ল।

এ কী, অ্যালার্ম কোথায়? এ তো তার এডিটর সায়নদার ফোন! সর্বনাশ, কপালে দুঃখ আছে। মোট তিনবার রিং করেছে। প্রতিবারই সে অ্যালার্ম ভেবে বন্ধ করে দিয়েছে। আদৌ সে কোন অ্যালার্ম দেয়ইনি। অ্যালার্ম সেট করতে ভুলেই গেছিল!

সে কাঁপা হাতে রিং ব্যাক করে। টানা পৌনে তিন মিনিট ধরে প্রবল দাবড়ানি এবং ওর পক্ষ থেকে প্রচুর কাকুতি মিনতির পর কোনক্রমে অবস্থা সামাল দেওয়া যায়। 'তাহলে কখন বেরচ্ছিস? অ্যাসাইনমেন্টটা কিন্তু তুই জোর করে নিয়েছিস।'

তা নিয়েছে। বাইরে গিয়ে কাজ করার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এবং কাজটাও অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং। তবে এক্ষুনি বেরোতে হবে, সেটা বোঝেনি।-"তুমি কিচ্ছু চিন্তা কোর না প্লিজ, আমি সব সামলে নেব। ব্যাগ গোছানই আছে। জাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার।"

বাঁকুড়া তার এই প্রথম যাওয়া। আশেপাশের জায়গা গুলো সম্পর্কে নেটে আগে থেকেই একটু ঝালিয়ে নিয়েছিল। রোহন সম্পর্কেও দেখছিল। কোথায় কী কাজ করেছে, সে সব ছাড়া ব্যাক্তিগত তেমন কিছু তথ্য সেখানে নেই।

"হাই, আমি মহুল।"

নীল স্করপিওর সামনের সিটে বসা শ্যামলা ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে নড করলো। ঝাঁকড়া চুল, বড় চোখ, সিনেমার হিরোর মত চেহারা। রীতিমত সুপুরুষ! ভাবা যায়, সমাজের একদম নিচের তলা থেকে উঠে আসা এ ছেলেটি আজ বিখ্যাত ড্যান্সার!

"আমি কিন্তু আপনার একটা ডিটেইলড ইন্টারভিউ করবো। কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি এই ইন্টারভিউটার জন্যই।"

হাসি মুখে ছেলেটি আবার ঘাড় ফেরায়। -"আপনি তো ফিল্মটার ওপরেও লিখছেন।"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আউটডোরে এসেছি...তবে পাখির চোখ আপনার ওপর। হাঃ হাঃ, এমনভাবে বললাম...প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড!"

"আয় অ্যাম অনারড ম্যাম!" সে মাথা ঝাঁকায়, অমায়িক হাসে।

যাদবপুর এইটবি থেকে গাড়িতে ওঠার পর গাড়ি কোথাও থামেনি। লাঞ্চ হয়নি। বাথরুম যাবারও দরকার। সামনে বর্ধমান আসছে। কিছু বলতে হল না, গাড়ি আপনিই ব্রেক দিল। দুড়দাড় করে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পরে। সায়নদা ফোন করে, "সব ঠিক আছে তো রে?"

মহুল ভেবেছিল, কার না কার সঙ্গে গাড়ি শেয়ার করতে হবে। কিন্তু রোহন এবং সঙ্গে দুটো অতি লাজুক ছেলে ছাড়া এ গাড়িতে আর কেউই উঠলো না। তারা আবার চুপটি করে একদম পেছনের সিটে উঠে বসে আছে। মাঝের লম্বা সিটে মহুল একা।

সায়নদা বলেছিল, ওরা যত্ন করে নিয়ে যাবে। তবে এত যত্নেও অস্বস্তি হয়। দু'একবার ডেকেওছে সে ওদের। তারা সেই লাজুক ভাবে মাথা নেড়ে জানিয়েছে, ওদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

বর্ধমানে পনেরো মিনিট লাঞ্চ ব্রেক। বলা যায়, লেট লাঞ্চ। এরপর রোহন এসে ওর পাশে মাঝের সিটে বসলো।– "শুনেছি ছোট বয়সেই আপনি মা-বাবাকে হারিয়েছেন। সেখান থেকে আপনার এই এতটা জার্নি... আই মিন, আপনার এই সাকসেস, এ তো পুরো গল্পের মত! আমরা কি এখন একটু আধটু কথা শুরু করতে পারি?"

"বেশ তো, এতটা রাস্তা, কথা বলতে বলতে যাওয়া যেতেই পারে। আমি প্রথম বড় সুযোগটা পাই ন্যাশনাল চ্যানেলের এক রিয়ালিটি শোয়ে। সত্যি সেই জার্নিটা ছিল স্বপ্নের মতই। খোলা আকাশের নিচে বড় হওয়া একটা ছেলে হঠাৎ করে হাজার হাজার ওয়াটের আলোর নিচে, এ তো রূপকথার গল্পই।"

মহুল রোহনের দিকে তাকিয়ে থাকে, ...কেমন একটা মায়া হয়। আর আবার সেই মনে হওয়াটা ফিরে আসে। কোথায় যেন সে দেখেছে ওকে! অর্ক শুনলেই বলতো, "দেখ গিয়ে তোমার হাজার হাজার ফেসবুক ফ্রেন্ডের মধ্যে ঢুকে বসা কোনও ফ্রেন্ড। পাগল একটা!"

কথাটা খুব মিথ্যেও না। এ রকম আগেও হয়েছে। তবে এ ছেলেটা তো কখনই ওর ফেসবুক ফ্রেন্ড নয়! বেশ অনেক সেলিব্রিটিই তার ফেবু ফ্রেন্ড। এবং তাদের প্রত্যেককেই ওর বেশ ভাল মনে আছে। সত্যি কথা বলতে কী, ফেসবুক তো লাস্ট কয়েক বছরের ব্যাপার। তার আগেও কারুকে কারুকে দেখে ওর মনে হত, খুব যেন চেনা। কেউ কেউ আইডেন্টিফায়েডও হত। হ্যাঁ, এ তো সেই বাবা-মা'র সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছিল অথবা কাকাইয়ের সঙ্গে সুমনের গান শুনতে গিয়ে কলামন্দিরে আলাপ হয়েছিল? কখনো আবার তার কারুকে মনে হত, বহুযুগ আগে দেখা, যেন পূর্বজন্মের চেনা-শোনা! সত্যি, কী ক্ষ্যাপা সে!

নাঃ, এ ছেলেটার ক্ষেত্র আরও একটু অন্য রকম। একে যেন এ জীবনেরই কোন এক সময়সারণীতে অনেকটা বেশি করে দেখেছে। কেমন নীল কুয়াশায় মাখা সেই স্মৃতি। ধুস, সিরিয়াসলি এবার তাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। এরকম অদ্ভুত 'চেনা চেনা লাগা'র রোগটাকে বাগে আনতে হবে। নিজেরই হাসি পেয়ে যায় তার। সত্যি সে বড় পাগল!

অর্ককে একবার ফোন করা দরকার। বেচারা জানেও না, ও আউট অফ স্টেশন হয়েছে। আসলে ও-ও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে জোর করে চলে এসেছে। অর্ক এখন সিঙ্গাপুরে, অফিসের কাজে। ফিরতে দিন সাতেক। কলকাতায় থাকলে ফট করে ওকে বাঁকুড়ার মত অজানা জায়গায়, অচেনা লোকজনের সঙ্গে কিছুতেই ছাড়ত না। তবে মহুলের ধারণা, বার কয়েক কায়দা করে বাইরের অ্যাসাইনমেন্ট গুলো ঠিকঠাক উতরে গেলে, অর্ক আর বাধা দেবে না।

বাঁকুড়ার সোনামুখী। পাশেই জঙ্গল। সন্ধ্যার মুখে গিয়ে পৌঁছল। হিহি করে দাঁত কাঁপানো ঠান্ডা। শুটিং তখন প্যাক আপ। আবার পরদিন ভোর সাড়ে ছটায় কলটাইম। রোহনের সঙ্গে টুকটাক অনেক কথাই হল। তবু মূল সুরটা ঠিক ধরা পড়লো না।

ছোট্ট শহরতলি। পৌরসভার অতিথি নিবাসে থাকার ব্যবস্থা। পরপর সব ঘর গুলোতেই শ্যুটিং পার্টির লোকজন। সামনের ড্রাইভওয়েতে ছাউনির তলায় রান্নার বিরাট ব্যাবস্থা। হাঁড়ি-কড়া এবং রাঁধুনি-জোগাড়ের ব্যস্ততা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লোকজন নেহাত কম আসেনি। বাইরের কোন এন্টারটেইনমেন্ট এর ব্যাপার নেই। অতএব কাজ শেষে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা। ঠান্ডাও পড়েছে জব্বর। একটু রেস্ট নিয়ে মহুল নেবে এল নিচে।

উনুনের গনগনে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোহন। হয়তো ওপরের ব্যালকনি থেকে ওকে দেখে, আরও বেশি করে নিচে নেমে আসার ইচ্ছে হল মহুলের। কাল শুটিং শুরু হলে ব্যস্ততা বেড়ে যাবে। যতটা পারা যায় রোহণনের সঙ্গে আজই কথা বলে

আউট লাইনটা তৈরি করে ফেলতে হবে। ভাল করে স্টোরিটা নামাতে পারলে, একটা কাজের কাজ হবে।

"কফি খাবেন?" রোহন হাতের কফিকাপ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"দারুণ... সত্যি বলতে কী, ঠান্ডায় এই কফির কথাটাই ভাবছিলাম।" জোগাড়ে ছেলেটা এক কাপ গরম কফি এনে হাতে ধরিয়ে দেয়। উনুনের পাশে দাঁড়িয়েই কফি খেতে খেতে সে বুঁদ হয়ে শোনে রোহনের জীবন কথা। সাকসেস নয়, স্ট্রাগলের কথা। সাকসেস তো সে নেটেই পেয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে আউটডোরে আসা এবং এতক্ষণ ধরে কথা বলার অ্যাডভান্টেজ। আবেগগুলো শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসেই!

– "এক সময়ে খালি গায়ে দিন কেটেছে। এরকম শীতেও। নদীর পাশে ইটখোলার মধ্যে বেড়ে ওঠা। কিছু বোঝবার আগেই মা মারা গেল। সম্ভবত অন্যরকম মৃত্যু ছিল। থানা পুলিশের ঝামেলার ভয়ে ইট খোলার মালিক একপ্রকার নামকাওয়াস্তেই আমার দায়িত্ব নিল। বাবা তো আগেই অন্য এক কামিনের সাথে কেটে পড়েছিল।"

সাংবাদিকতার প্রথম শর্তই আবেগ দমন। সব জেনেও মহুলের বুকের ভেতর ব্যথা করে। তার থেকে সামান্য বড় এই সুপুরুষ ছেলেটির দিকে সে মমতামাখা চোখে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটার বড় বড় চোখ জুড়ে থাকা কুচকুচে কালো আইবলগুলোতে উনুনের দাউদাউ আগুনের কমলা ছায়া।

"বুঝতে পারছি!... আচ্ছা নাচ, মানে এই স্পেসটায় এলেন কেমন ভাবে? আপনার সেই বেড়ে ওঠার নদীর ধার, ইটখোলা...তা কোথায় ছিল, জানতে পারলাম না। যদি একটু..."

আচমকা রূঢ় হয়ে ওঠে রোহণ। –"কলাতলি,আমতলি, জামতলি...গঙ্গার পাশে কোন একটা জায়গা; সেটা কি খুব ইম্পরট্যান্ট? নদী, ইটভাটা এবং সব জায়গা থেকে লাথি খাওয়া একটা শিশুর জীবনযাপন...সবটাই তো বলা হল। এটাই তো যথেষ্ট স্টোরি!" - "আয় আম এক্সট্রিমলি সরি রোহন!" প্রচণ্ড থতমত খেয়ে যায় মহুল। অকারণেই সে তার লম্বা বিনুনি আঙুলে পেঁচাতে থাকে। রোহন আবার যেন কী বলছে...কিন্তু মহুল ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনের ভেতর প্রবল ভাবে ঘুরপাক খায়- জামতলি! -"আরে আমার তো বাড়ি..." ব্যাক্তিগত কথা বলার জায়গা নয় সাংবাদিকতা। সে থেমে যায়। তাছাড়া রোহনের দু'একটা কথা সে স্কিপ করে গেছে। কী বলছে এখন? অহ, ও-ও সরি বলছে!

–"নেভার মাইন্ড রোহন!" মহুল গালে টোল ফেলে অপূর্ব একটা হাসি দেয়। রোহনও লাজুক হাসে। হঠাৎ করে মুড সুইং করার জন্য ছেলেটা সত্যি খুব লজ্জিত হয়েছে। "তাহলে সেই থানা থেকে ডক্টর এডওয়ার্ডের এনজিও। ওখান থেকেই আপনার ডান্স স্কুলে আসা? মানুষটি এবং তাঁর এনজিও – দুটোই খুব লিবারাল অ্যান্ড ডিভোটেড ছিল বলছেন।"

"ইয়েস, আবসলিউটলি! উনি আমার কাছে ভগবান! তবে ওনার কাছে যাই আমি এক অ্যাঞ্জেলের হাত ধরে।"

"রিয়েলি! সেটা শুনতে পারি কি?" কথাটা বলেই আড়চোখে একবার মেপে নেয় মহুল। ছেলেটা আবার রেগে যাবে না তো? নাহ, রোহনের মুখে এক অদ্ভুত শান্ত সম্মোহনের ছায়া।

–"শেষ কীর্তি ছিল চুরি। এভাবেই থানা-পুলিশের মুখোমুখি। তখন পেট-পিঠ লেগে যাওয়া, ঠিকমত খেতে না পাওয়া আট'ন বছরের রোগা টিংটিং ছেলে। এক চোর ডাকাতের দলের খপ্পরে পড়লাম। এরকমই শীতের শেষ রাত। তারা ঢুকিয়ে দিল সে অঞ্চলের সব চেয়ে রহিস আদমির বাড়ি। এক তলার বাথরুমের জানলা দিয়ে কোনওক্রমে শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম। সদর দরজা খুলে দেওয়া অব্দি আমার কাজ ছিল।"

“তারপর?” মহুলের চোখ বিস্ফারিত।

“ধরা পড়ে গেলাম! আমি এবং আরও তিনজন। লোকজন এসে বিরাট মারধর। ছোট বলে সামান্য রেয়াত করা হয়েছিল আমায়। তবু নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সম্মিলিত মারধোর তো। গায়ের জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাই। পুলিশ এল। শীতে কুঁকড়ে বসে আছি আমি। ভোর হয়ে গেছে। বাবার স্কুটারে চেপে স্কুল যাচ্ছিল সে। আমার অবস্থা দেখে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। নিমেষে নিজের স্কুল ইউনিফর্মের সোয়েটার খুলে আমার হাতে দেয়। ঠান্ডা হাওয়া এবং কান্নার দমকে ছোট্ট শরীরটা তার থিরথির করে কাঁপছিল। আজ বুঝতে পারি, সমবেত জনগণ এবং পুলিশকে সেদিন ও কতটা অপ্রস্তুত করেছিল। বাচ্চাদের তো স্ট্যাটাস বোধ থাকেনা। গঙ্গার ধারে আরও কয়েকজন বাচ্চার সঙ্গে আমিও ছিলাম তার খেলার সঙ্গী। ততক্ষণে ব্যাগ থেকে লাল রঙের টিফিন কৌটো বার করে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছে। আমার জীবনে পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার, শ্রেষ্ঠ আদর!”

নীল কুয়াশার ভেতর দিয়ে আচমকা আগুনের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক চলমান ছবি! তুমুল ভাবে কেঁপে ওঠে মহুল! তার ঠোঁট কাঁপে, কিন্তু একটা শব্দও বার হয় না। শুধু তাকে ঘিরেই শুরু হয়ে যাওয়া এক প্রবল ভূমিকম্পের মধ্যে সে হাবুডুবু খায়! অনেক চেষ্টাতেও বাগ না মানা নোনা জলের প্রবাহ, সমস্ত এটিকেট ভাসিয়ে নিয়ে যায়! ঠিক তখনই, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে ছেলেমেয়ে দুটোর পাশে এসে দাঁড়ায় জোগাড়ে ছেলেটা। -‘স্যার, আপনাদের আর একবার কফি দেব?’ উনুনের লালচে আগুনের ছায়া কাঁপছে ছেলে-মেয়ে দুটোর ঋজু শরীরে। ওদের শূন্য কাপে, সে নিজে থেকেই ধোঁয়া ওঠা গরম কফি ঢেলে দেয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিউরোএথিকস্ ল্যাবে জোরকদমে রিসার্চ চলছে। অনিমেষের ধ্যানজ্ঞান সবকিছু এখন এই প্রেম-পিল বা প্রেমের বড়ি বা ট্যাবলেট আবিষ্কারকে ঘিরে। আধুনিক যুগে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাটির সমাধান করে ছাড়তে অনিমেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বায়োটেকনোলজির সঙ্গে ফিজিওলজিকে অদ্ভূতভাবে মিশিয়ে মানুষের স্নায়ুকলার সঙ্গে প্রেমের রাসায়নিক দোস্তি পরখ করছেন তিনি। আর প্রেম বা অপ্রেমের মত স্নায়বিক অনুভূতির ফলে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার চলন, গমন স্টাডি করছেন তাঁর টিম। জটিল রসায়ন। মানুষ প্রেমে পড়লে হিউম্যান ব্রেইনে একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। আবার কেউ বহুদিন প্রেমে পড়েন নি তাদের ব্রেইনে সেই রাসায়নিক পদার্থটি সঞ্চার করিয়ে জীবনে প্রেমের জোয়ার আনতেও সক্ষম হবেন, এই আশা রাখছেন তাঁরা।

মানুষের মন আর শরীরের অভ্যন্তরে কি ঘটনা ঘটলে মানুষ প্রেমে পড়ে আর সেই ঘনিষ্ঠ প্রেম থেকে বিচ্ছেদ হলেই বা শরীরের অভ্যন্তরে দেহরসের সমীকরণ কিভাবে বদলে যায় তা নিয়েই তাঁদের রিসার্চ। আর সেটা বুঝতে পারলেই পরের ধাপ হল ওষুধ প্রয়োগ করে প্রেমের গতিবিধিকে কন্ট্রোল করা। যেখানে প্রেম ঘনীভূত হওয়া প্রয়োজন সেখানে ওষুধ দিয়ে তাকে যথার্থ বশে আনা অথবা যে অদরকারী প্রেমের সম্পর্ককে অবিলম্বেই ছেঁটে দেওয়া দরকার সেখানে ওষুধ প্রয়োগে প্রেমের সমীকরণকে উল্টোদিকে হাঁটতে বাধ্য করা।

এখানে অনিমেষের মুশকিল একটাই। প্রেমের মত নরম অনুভূতি মানুষ নামক জীবটির পক্ষেই প্রযোজ্য। তাই বাঁদর, গিনিপিগ বা ইঁদুর দিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টের যথার্থতা স্টাডি করা দুষ্কর। সেক্ষেত্রে মানুষকেই কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু রক্তমাংসের কোন মানুষই বা হবে অনিমেষের গিনিপিগ? নতুন ওষুধের প্রকোপে যদি প্রাণহানি ঘটে? অথবা বিপজ্জনক কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে দেহের ক্ষতি হয়?

না, না। আটঘাট বেঁধেই নেমেছে সে। পশুদের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে টক্সিসিটি লেভেল টেস্ট করেছেন তাঁরা। থিওরিও তাই বলছে। কোন প্রাণীর ক্ষতি হয় নি। মৃত্যু তো নয়ই। আর প্রেম? সেটা ত মানুষের শরীরে প্রয়োগ না করলে বোঝা যাবে না। কোন উপায় নেই।পশুপাখির আবেগ কি মানুষের মত জোরদার? তাদের অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধুই বর্তমান। তাই ভালোবাসাবাসি শুধুই রমণের সময়। তাৎক্ষণিক একটা মুহূর্ত। মানুষের আবেগ, বেগ দুইই প্রকট। পশুদের যেন কেবলই বেগ সর্বস্বতা। এখুনি খেতে হবে অথবা মৈথুনে মেতে উঠতে হবে। কিম্বা প্রতিমূহুর্তে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের ডিফেন্স মেকানিজম কে চাগিয়ে তোলা। আক্রমণ করতে হবে প্রতিপক্ষকে। তাই সদা জাগ্রত থাকা। প্রেমের মত সূক্ষ্ম অনুভূতির পরীক্ষা নিরীক্ষায় তারা বুঝি সাড়া দিতে পারবে না বলেই বিশ্বাস বিজ্ঞানীদের।

অনিমেষের বউ শুক্তিশুভ্রা নিজের কিউরিওসিটির বশে জানতে চাইত আগে আগে।মাঝেমধ্যে হঠাত করেই ল্যাবে হানা দিত। আড্ডা হত সকলের সঙ্গে।তারপর চা খাওয়া।বেশ সমবয়সী সকলেই। ভাল লাগত কোয়ালিটি টাইমপাস।

নিউরোএথিকস্ ল্যাবে অনিমেষ ছাড়াও জনা চারেক নিউরোসায়েন্টিষ্ট। অনিমেষ নিজে দুঁধে বায়োটেকনোলজিষ্ট। কি কাজ হচ্ছে বলত বাপু? জিগেস করলে সে বোঝাত শুক্তি কে।

মানুষের জীবনের প্রেম নামক রোমান্টিক অনুভূতি কোন রাসায়নিক প্রয়োগে জাস্ট জ্বলে ওঠে সেই ম্যাজিক পিল আবিষ্কারে মগ্ন তারা। আবার উল্টোটাও দেখতে হবে বৈকি। বিচ্ছেদ বা প্রেমে হার্টব্রেক । সেই ম্যাজিক পিল প্রয়োগে তাকে আটকাতে হবে অথবা ঘটাতেই হবে।

মানুষের দেহে ডোপামিন নামে একটি নিউরোহরমোন নিঃসৃত হয়। এটি ভালোলাগা, আনন্দের ফিলিংস এর মত কোমল অনুভূতির জোগান দেয়। আর সেই সঙ্গে এপিনেফ্রিন আর নর-এপিনেফ্রিন নামের আরো দুটি রাসায়নিক পদার্থ উত্তেজকের কাজ করে। এরা মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার তুমুল বৃষ্টি সঞ্চারিত করে।

এবার বুঝেশুনে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই কেমিক্যালস গুলি বাড়িয়ে কমিয়ে প্রেম-পিলের একজ্যাক্ট ডোজটি কন্ট্রোল করতে হবে।

অঙ্কের ছাত্রী শুক্তি হাসে। কোনো ইন্টারেস্ট পায়না এসবে। "আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখাও' মনে মনে হাসে সে।

হাসতে হাসতে বলেছিল, বহুদিনের বিবাহিত জীবনে যাদের প্রেম অধরা তাদেরো কাজে আসবে এই ওষুধ?

অনিমেষ বলেছিল, আলবাত! সেই চেষ্টাটাই তো করে চলেছি আমরা অহোরাত্র।

শুক্তি বলেছিল, হঠাত করে প্রেমহীন জীবনে প্রেমের দীপাবলী জ্বলে উঠবে?

অনিমেষ বলেছিল, নয়ত কি? আমরা কি ভেরেণ্ডা ভাজছি নাকি?

শুক্তি বলেছিল, আবার ধর কেউ দীর্ঘদিন ভেবেই চলেছেন যে অসহনীয় কোনও প্রেম থেকে নিজের জীবনকে অব্যাহতি দিতে। মানে, তাদেরও বিচ্ছেদ তরাণ্বিত করবে এই ম্যাজিক ওষুধ ?

অনিমেষ বলেছিল, কাজ দেবে বৈকি।

আহা রে! মরে যাই। কত চেনা বন্ধুবান্ধব কষ্টে আছে। দেখি তাদের যদি কাজে আসে তবে। শুক্তি বলে

শুক্তিশুভ্রার এযাবৎ কিছুই ভাল লাগেনা। অনিমেষ না পারে তাকে বেশী সময় দিতে না পারে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে নিয়ে যেতে।

অনিমেষের যেমন কাজ। দিনদিন তার ল্যাব সর্বস্বতা যেন গ্রাস করছে তাকে। বিয়ের পর দুজনে বছরে একবার অন্তত কোথাও ঘুরতে যেত দিন সাতেকের জন্য। নিদেন শহরের কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার খেয়ে আসত। নিদেন একসঙ্গে বসে ট্যাবে শর্টফিল্ম দেখা?

শুক্তি একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। খুব দায়িত্ব তারও। আবার প্লাস টু এর ম্যাথস এর টিচার সে। তবুও অনিমেষ যেন আজকাল একটু একটু করে তার জীবন থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। একটা মেয়ে তাদের। সে ও দিল্লিতে ডাক্তারি পড়ছে। বছরের নির্ধারিত ছুটিতে বাড়ি আসে। শুক্তির শুধু স্কুল আর বাড়ি। অঙ্কের খাতা দেখা আর পেপার সেট করা। এই জীবন ছাড়াও শুক্তির জীবনের অনেকটা জুড়ে রয়েছে এযাবত তার জীবনের অধরা সৃষ্টিশীলতা... দু চার লাইন কবিতা লেখা।

অনিমেষ খুব হাসে শুক্তির এই কবিতা চর্চা দেখলে। বলে কী সব ছাইপাঁশ লেখ, আমার কাছে দুর্বোধ্য।আঁতেলের অর্থহীন বাক্যরচনা।

শুক্তি ভাবে, অনিমেষ কে নতুন করে ইম্প্রেশ করার কিছু নেই। তার লেখা কবিতা পড়ে অনিমেষ ভাল বলুক আর না বলুক তাতে তার কিচ্ছু আসে যায় না। শুক্তির ফেসবুকে হাজার দুয়েক বন্ধু। তার মধ্যে শ পাঁচেক ফ্যান ফলোয়ারস। তারা সে কবিতা পছন্দ করলেই হল। তাকে জীবনে বাঁচার রসদ খুঁজে দিয়েছে এই ফেসবুক। কবিতা লিখে শান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা। অতএব জীবনের শেষদিন অবধি এই নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারলেই হল। অনিমেষ থাকুক তার রিসার্চ ল্যাব নিয়ে। মেয়েটা থাকুক তার পড়াশুনোর চাপ নিয়ে। শুক্তির স্কুল, ম্যাথস আর স্টুডেন্টস নিয়েই জীবনের সব ওঠাপড়া। তার ফাঁকে এক ফোঁটা স্বস্তির আশ্বাস এই ফেসবুক।

ইদানীং অনিমেষ লক্ষ্য করেছে ফেসবুকে প্রিয়ম সিদ্ধান্ত নামে শুক্তির একজন স্টুডেন্টকে তার কবিতার নীচে গলে গলে পড়তে। ভাল ভাল কমেন্ট লিখে দিদিমণির কাছ থেকে আনুগত্য চায় সে? এত মুগ্ধতা কিসের? অনিমেষ ভাবে। শুক্তির লেখায় এমন কিছু শব্দচয়নও নেই। ভাষার সারল্যও নেই। কেবল আবেগপূর্ণ চার পাঁচটি লাইন। কবিতার অর্থও পরিষ্কার নয়। শুক্তির কবিতা পড়ে অনিমেষের মনে হয় শুধুই হতাশা আর দুঃখবিলাসিতা । কি খোঁজে পাবলিক এই কবিতার মধ্যে? আর বিশেষত এই প্রিয়ম নামের ছেলেটি, কী দেখল শুক্তির এই কবিতা গুলোয়? অনিমেষ ভাবে আবার খেই হারিয়ে ভাটা পড়ে সেই চিন্তায়। নিজের কাজে ডুবে যায় অচিরেই। খাবার টেবিলে দুজনের যা দেখা সাক্ষাৎ হয়। শুক্তি খেতে খেতে হাতের ফোন নিয়ে খুটখাট করে। টুং টাং মেসেজ আর নোটিফিকেশনের শব্দ অনিমেষকে বিব্রত করে। ভাল লাগে না অনিমেষের। আগে এমন হত না। দুজনের কাজের পরিধির যত বিস্তার হল ততই গুমোট হল যেন বাড়ির পরিবেশ।

অনিমেষ আর শুক্তিশুভ্রার জীবনে প্রেম বেঁচে নেই বহুদিন ধরে। কেমন যেন আড়োআড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব দাম্পত্যের রোজনামচায়। মধ্যবয়সে শরীর বাধ সাধে অনেক সময় কিন্তু তাই বলে মন? আজ তারা মানসিকভাবে এতটা দূরে সরে গেছে? নিজেকে অনিমেষ দায়ী করেনা তার জন্য। শুক্তিও তো অনিমেষ কে একটু বুঝতে পারত। কত বড় দায়িত্বপূর্ণ গবেষণায় সে ব্যস্ত থাকে আজকাল? এই আবিষ্কার সফল হলে বিশ্ব সংসারে কত ডিভোর্স কেসের নিষ্পত্তি হতে পারে। কত টিন এজাররা বেঁচে যাবে আত্মহত্যার হাত থেকে। ম্যাজিক পিল খাবে আর রোগের হাত থেকে মুক্তি পাবে। হয় নতুন করে প্রেমে আহুতি দেবে নয়ত বিচ্ছেদে অবগাহন করবে। এই আশ্চর্য "প্রেম-পিল্' জাগতিক সমস্ত প্রেমের ডায়নামিক্স এবং রসায়ন আমূল বদলে দেবে। তামাম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে ওষুধ প্রয়োগে প্রেমের ভাষা পড়ে বোঝা এবং তাকে কন্ট্রোল করা, ম্যানিপুলেট করা এই প্রথম। অনিমেষ নোবেল প্রাইজ পেলেও পেতে পারেন। তাঁর সতীর্থ সহপাঠীরা যদিও ঠাট্টা করে বলে "তুমি আর তোমার টিম এই প্রথম হিউম্যান ইমোশানস কে মেকানিক্যাল বানিয়েই ছাড়ছ, গুরু"

কেউ আবার বলেছে, "যত্তসব, খোদার ওপর খোদকারি'

অনিমেষের সে ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই অবিশ্যি। তিনি এই গবেষণার শেষ দেখেই ছাড়বেন। মানুষের কাজে এলেই সার্থক তিনি।

তিনি খুঁজেই চলেছেন সেই "এলিক্সির অফ লাভ' নামের রাসায়নিক পদার্থটিকে যেটির প্রভাবে ঠিকঠাক ভাবে নরনারীর ভাব ভালোবাসা ঘনীভূত হয় যথার্থ প্রেমে। রাসায়নিক ভাষায় তার নাম লাভ এনহান্সার বা প্রেম বর্ধক আর যে রাসায়নিক বস্তুটির অভাবে জীবন থেকে ভালোবাসা উবে যায় সেটির নাম লাভ ব্লকার বা প্রেম রোধক । তাঁদের ম্যাজিক পিলটি এখানে কাজ করবে মডিউলেটর হিসেবে। যেখানে যেমন ডোজে প্রয়োগ করা হবে তেমনি হবে তার কাজ।

সাইকোলজিস্ট, রিলেশনশিপ বিশেষজ্ঞরা আস্থাবান অনিমেষের এই প্রোপোজালে। তাঁদের অহোরাত্র এইসব নিয়ে কাজ। ওষুধ পেলে বরতে যাবে তাঁদের লাখ লাখ ক্লায়েন্টস।

অবিশ্যি অনেকেই বলেছেন, এ আবিষ্কার ভিত্তিহীন। দোহাই বিজ্ঞান! প্রেম, রোমান্স আর রাসায়নিক প্রয়োগ? বুলশিট্! প্রেমে পড়া আর প্রেম থেকে বেরিয়ে আসা? দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ! নিউরোসায়েন্স নার্ভের বাকী দিকগুলো দেখুক। প্রেম কে নয়।

অতঃপর অনেক ভেবেচিন্তে শুক্তিই হল টার্গেট। তার ওপরেই প্রথম পরীক্ষা চালাবে অনিমেষ। শুক্তির ভারচ্যুয়াল প্রেমিক ঐ প্রিয়ম্ নামের স্টুডেন্টটির ওপর মধ্যবয়সের এত ক্রাশ আর সহ্য করা যায় না। সুখের সংসার ছিল তাদের। শুক্তি এক সাবালিকার মা। এই বয়সে তার এ কি মতিভ্রম হল? ছেলের বয়সী একজন কে ভালো লাগতে শুরু করল? আর তাই অনিমেষকে দূরে সরিয়ে রাখল সে?

এইসব ভেবে তাদের নতুন আবিষ্কারের প্রেম-পিলের "ব্লকার' টি সেদিন ডিনার টেবিলে নিয়ে আসে অনিমেষ। রান্নার মাসী গরম রুটি বানিয়ে ভরে রেখে যায় ক্যাসারোলে। একে একে তরকারী গুলো মাইক্রো ওয়েভে গরম করে আনে শুক্তি। সাধারণতঃ নিজেরাই দুজনে খাবার সার্ভ করে নেয় প্রতিদিন, নিজেদের ইচ্ছেমত, সবজী, পনীরের তরকারি, ঘুগনী ইত্যাদি। মাসী স্যালাড কেটে দিয়ে যায় টাটকা। টক দৈ বের করে দেয় ফ্রিজ থেকে। আর শেষপাতে একটু ঠাণ্ডা কাস্টারড ।

সেদিন শুক্তির কান থেকে ঝুলছে ইয়ারফোনের দুই সুতো। বুঁদ হয়ে গান শুনছে সে। তার রংচঙে হাউজকোটের মধ্যে রাখা সেলফোনে টুংটাং মেসেজ আসতেই থাকছে প্রতিদিনের মত । এই মেসেজ, নোটিফিকেশন যাওয়া এবং আসা দুইই খুব অপছন্দ অনিমেষের।

টুকটাক রিপ্লাই দিতে দিতে, গান শুনছে আর সেই সঙ্গে খাবার গরমও করছে শুক্তি । আর অনিমেষ সুযোগ বুঝে একটি কাঁচের বাটিতে সেই "ব্লকার' প্রেম-পিল টি টুক করে রেখে তার মধ্যে এক টেবিল স্পুন ঠাণ্ডা কাস্টারড তুলে রেখেছে শুক্তির জন্য । শুক্তির সব দিকে চোখ ঘোরে। সে দেখেও না দেখার ভান করল। বুঝল আজ সে হবে অনিমেষের গিনিপিগ। আগে প্রিয়মের বিষয়ে দু একবার পুছতাছ করেছে অনিমেষ। পাত্তা দেয়নি শুক্তি। বুদ্ধি খুব তার। কায়দা করে এড়িয়ে গেছে। এই বয়সে তার এতদিনের জীবনসঙ্গী তাকে সন্দেহ করছে তবে।

শুক্তি ভাবে, দেখাই যাক। অনিমেষের সন্দেহ বাড়ছে বাড়ুক। অবিশ্বাসের লেখচিত্র তুঙ্গে উঠুক।

বেচারা তুখোড় বৈজ্ঞানিক ডঃ অনিমেষ তবে চেষ্টা করছে শুক্তির সঙ্গে তার ছাত্র প্রিয়মের সম্পর্কের একটা হেস্তনেস্ত করতে। অঙ্কের দিদিমণি শুক্তি । মাথায় বুদ্ধি খুব তার। এতদিন ফেসবুকে শুক্তির কবিতা লেখা থেকেই অনিমেষের যত্ত রাগ। আজ তাই অনিমেষ তার নিষ্পত্তি করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

খাওয়া শুরু করল দুজনে। রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে আবারো মেসেজ। খাওয়া থামিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুলেই উভয় পক্ষের সংলাপ চলতে থাকে। অসহ্য লাগে অনিমেষের। আজকেই হেস্তনেস্ত হবে এই সম্পর্কের। রুটি সব্জি সব খাওয়া শেষ।

ব্লকার প্রেম-পিল সমেত সেই কাঁচের কাস্টারডের বাটিটি যতই সে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে অনিমেষ ততই ছুতোয়নাতায় কথার মারপ্যাঁচে শুক্তিকে জব্দ করে সেটা খাওয়াতে ব্যস্ত হয়। এবার শুক্তির জেদ চেপে যায়। সে বলে বসে, কই? শুধু ব্লকার পিল দিলেই চলবে? এনহান্সার পিল কোথায় আছে দাও দেখি। আমার স্টুডেন্ট প্রিয়মের গার্লফ্রেন্ড রুচির সঙ্গে হার্টব্রেক হয়েছে। খুব কষ্টে আছে ওরা। ওরা দুজনেই আমার খুব ভাল স্টুডেন্ট। ফাইনাল ইয়ার ওদের। স্কুলে এই নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। অনলাইন কাউন্সেলিং করছি আমি সারাদিন ধরে। ওদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে এবার। আমি চাই ওদের অ্যাফেয়ার টা আবারো জোড়া লাগুক। তা তোমাদের ল্যাবের আবিষ্কৃত এই প্রেম-পিল ওদের দিতে পারি তো?

???? ???? ??, ?????? – ????????????? ???

দুঃখকে স্বীকার করো না, –সর্বনাশ হয়ে যাবে ।
দুঃখ করো না, বাঁচো, প্রাণ ভরে বাঁচো ।
বাঁচার আনন্দে বাঁচো । বাঁচো, বাঁচো এবং বাঁচো ।
জানি মাঝে-মাঝেই তোমার দিকে হাত বাড়ায় দুঃখ,
তার কালো লোমশ হাত প্রায়ই তোমার বুক ভেদ করে
চলে যেতে চায়, তা যাক, তোমার বক্ষ যদি দুঃখের
নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়; যদি গলগল করে রক্ত ঝরে,
তবু দুঃখের হাতকে তুমি প্রশ্রয় দিও না মুহূর্তের তরে ।
তার সাথে করমর্দন করো না, তাকে প্রত্যাখান করো ।

অনুশোচনা হচ্ছে পাপ, দুঃখের এক নিপুণ ছদ্মবেশ ।
তোমাকে বাঁচাতে পারে আনন্দ । তুমি তার হাত ধরো,
তার হাত ধরে নাচো, গাও, বাঁচো, ফুর্তি করো ।
দুঃখকে স্বীকার করো না, মরে যাবে, ঠিক মরে যাবে ।

যদি মরতেই হয় আনন্দের হাত ধ'রে মরো ।
বলো, দুঃখ নয়, আনন্দের মধ্যেই আমার জন্ম,
আনন্দের মধ্যেই আমার মৃত্যু, আমার অবসান ।

???? ???? – ???? ????????

তোমাকে দেখবো বলে একবার কী কাণ্ডটাইনা করেছিলাম
‘আগুন আগুন’ বলে চিৎকার করে
সমস্ত পাড়াটাকে চমকে দিয়ে
তোলপাড় ক’রে
সুখের গেরস্তালিতে ডুবে-যাওয়া লোকজনদের
বড়শি-গাঁথা মাছের মতো
বাইরে টেনে নিয়ে এলাম
তুমিও এসে দাঁড়ালে রেলিঙে

কোথায় আগুন?
আমাকে পাগল ভেবে যে-যার নিজের ঘরে ফিরে গেলো ।
একমাত্র তুমিই দেখতে পেলে
তোমার শিক্ষিত চোখে
আমার বুকের পাড়ায় কী-জবর লেগেছে আগুন ।

???? ???? – ??????? ????

আমার জীবন আমি ছড়াতে ছড়াতে
এসেছি এখানে,
আমি কিছুই রাখিনি-
কুড়াইনি তার একটিও ছেঁড়া পাতা,
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছি শিমুল তুলোর মতো
সব সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্মৃতি,
আমি এই হারানো জীবন আর খুজি নাই
সেই ফেলে আসা পথে;

ছেঁড়া কাগজের মতো ছড়াতে ছড়াতে এসেছি আমাকে।
পথে পড়ে থাকা ছিন্ন পাপড়ির মতো
হয়তো এখানো পড়ে আছে
আমার হাসি ও অশ্রু,
পড়ে আছে খেয়ালি রুমাল, পড়ে আছে
দুই এক ফোঁটা শীতের শিশির;
এখনো হয়তো শুকায়নি কোনো কোনো অশ্রুবিন্দুকণা,
বৃষ্টির ফোঁটা
চঞ্চল করুণ দৃষ্টি, পিছু ডাক,
হয়তো এখনো আছে সকালের মেঘভাঙা রোদে,
গাছের ছায়ায়
পদ্মাপকুরের স্থির কালো জলে,
হয়তো এখনো আছে হাঁসের নরম পায়ে
গচ্ছিত আমার সেই হারানো জীবন
সেই সুখ-দুঃখ
গোপন চোখের জল।
এখনো হয়তো পাওয়া যাবে মাটিতে
পায়ের চিহ্ন
সেসব কিছুই রাখিনি আমি
ফেলতে ফেলতে ছড়াতে ছড়াতে
এখানে এসেছি;
আমি এই জীবনকে ফ্রেমে বেঁধে রাখিনি কখনো
নিখুঁত ছবির মতো তাকে আগলে রাখা হয়নি
আমার,
আমার জীবন আমি এভাবে ছড়াতে ছড়াতে এসেছি।

আমার সঞ্চয় আজ কেবল কুয়াশা, কেবল ধূসর
মেঘ
কেবল শূন্যতা
আমি এই আমাকে ফ্রেমে বেঁধে সাজিয়ে রাখিনি,
ফুটতে ফুটতে ঝরতে ঝরতে আমি এই এখানে
এসেছি;
আমি তাই অম্লান অক্ষুণ্ন নেই, আমি ভাঙাচোরা
আমি ঝরা-পড়া, ঝরতে ঝরতে
পড়তে পড়তে
এতোটা দীর্ঘ পথ এভাবে এসেছি
আমি কিছুই রাখিনি ধরে কোনো মালা, কোনো ফুল,
কোনো অমলিন স্মৃতিচিহ্ন
কতো প্রিয় ফুল, কতো প্রিয় সঙ্গ, কতো উদাসীন
উদ্দাম দিন ও রাত্রি
সব মিলে হয়ে গেছে একটিই ভালোবাসার
মুখ,
অজস্র স্মৃতির ফুল হয়ে গেছে একটিই স্মৃতির গোলাপ
সব সাম মিলে হয়ে গেছে একটিই প্রিয়তম নাম;
আমার জীবন আমি ফেলতে ফেলতে ছড়াতে ছড়াতে
এখানে এসেছি।

???????? ???? ?? ??????, ???????? ???????? ?????? –

?????? ????

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে
হুলিয়া,
হৃদয়ের তর্জমা নিষিদ্ধ আর মননের সম্মুখে প্রাচীর
বিবেক নিয়ত বন্দী, প্রেমের বিরুদ্ধে পরোয়ানা;
এখানে এখন পাখি আর প্রজাপতি ধরে ধরে
কারাগারে রাখে-

সবাই লাঞ্ছিত করে স্বর্ণচাঁপাকে;
সুপেয় নদীর জলে ঢেকে দেয় বিষ, আকাশকে
করে উপহাস।
আলোর বিরুদ্ধাচারী আঁধারের করে শুধু স্তুতি,
বসন্তের বার্তা শুনে জারি করে পূর্বাহ্নে কারফিউ,
মানবিক উৎসমুখে ফেলে যতো শিলা ও পাথর-
কবিতাকে বন্দী করে, সৌন্দর্যকে পরায় শৃঙ্খল।

?????? ???? ??? ??? – ??????????

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর; – সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন,
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।

সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো:
সেই দিনের – আলোর অন্তহীন এঞ্জিন চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর – পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন।

??? ??????? ??? – ???? ????

যদি ভালবাসা পাই আবার শুধরে নেব
জীবনের ভুলগুলি
যদি ভালবাসা পাই ব্যাপক দীর্ঘপথে
তুলে নেব ঝোলাঝুলি
যদি ভালবাসা পাই শীতের রাতের শেষে
মখমল দিন পাব

যদি ভালবাসা পাই পাহাড় ডিঙ্গাবো
আর সমুদ্র সাঁতরাবো
যদি ভালবাসা পাই আমার আকাশ হবে
দ্রুত শরতের নীল
যদি ভালবাসা পাই জীবনে আমিও পাব
মধ্য অন্তমিল।

??????? – ??????? ??

আমি নহি পুরূরবা। হে উর্বশী,
ক্ষনিকের মরালকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জান গড়ে তুলি আমার ভুবন?
এসো তুমি সে ভুবনে, কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে।
ক্ষণেক সেখানে থাকো,
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি
ঘুরি যে সময় নেই- শুধু তুমি থাকো ক্ষণকাল,
ক্ষণিকের আনন্দাঅলোয়
অন্ধকার আকাশসভায়
নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে যাও
নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে।

আর রাত্রি, রবে কি উর্বশী,
আকাশের নক্ষত্রাঅভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হয়ে রবে বহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ-কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক?
আমি নহি পুরূরবা। হে উর্বশী,
আমরণ আসঙ্গলোলুপ,
আমি জানি আকাশ-পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।

??? ??? ??? ??? ?????? – ??????????? ???

যদি আমি ঝরে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়;
যখন ঝরিছে ধান বাংলার ক্ষেতে-ক্ষেতে ম্লান চোখ বুজে,
যখন চড়াই পাখি কাঁঠালীচাপাঁর নীড়ে ঠোঁট আছে গুজে,
যখন হলুদ পাতা মিশিতেছে খয়েরি পাতায়,
যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে-
তখন আমারে যদি পাও নাকো লালশাক-ছাওয়া মাঠে খুঁজে,
ঠেস্ দিয়ে বসে আর থাকি নাকো যদি বুনো চালতার গায়ে,

তাহলে জানিও তুমি আসিয়াছে অন্ধকার মৃত্যুর আহ্বান-
যার ডাক শুনে রাঙা রৌদ্রেরো চিল আর শালিখের ভিড়
একদিন ছেড়ে যাবে আম জাম বনে নীল বাংলার তীর,
যার ডাক শুনে আজ ক্ষেতে-ক্ষেতে ঝরিতেছে খই আর মৌরির ধান;-
কবে যে আসিবে মৃত্যু; বাসমতী চালে-ভেজা শাদা হাতখান-
রাখো বুকে, হে কিশোরী, গোরোচনারূপে আমি করিব যে ম্লান।

???? ??????? ??? – ?????????? ???

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে:
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।
যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনাদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠেছে।

মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধুসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারত সমুদ্রের তীরে
কিংবা বূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই কোনা এক নগরী ছিল একদিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ;
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্খা;
আর তুমি নারী-
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘর পল্লব ছিল অনেক;

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল;
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলারও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপারিত গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধুসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা

ময়ুরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস-
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমর নগ্ন নির্জন হাত;
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

??? – ??????????? ?????

কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে,
ভেবেছিলেম, হয়তো খুশি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের ‘পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক-তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে –
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকনদুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে।।

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে,
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে!
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে।
বাতাসেতে-উড়িয়ে-দেওয়া গানে

তারে কি আর স্মরণ করে পাখি?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন ক'রেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোনখানে।
তারাই জানে, বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে
হৃদয় দিতে দেখিতে হয় যারে –
যে পায় তারে সে পায় অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ ব'লেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।।

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্ খনিতে কোন্ ধনভান্ডারে,
সাগর-তলে কিম্বা সাগর-পারে,
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয় প্রিয়ে!
তাই তো বলি যা-কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান
আপন হৃদয় দিয়ে।।

?? ????????????? – ??????????? ?????

তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন ?
তোমার দুধের মধ্যে এত ঘন বিশৃঙ্খলা কেন ?
রক্ত ঝরে না ভেজালে
কোনো সুখ দরজা খোলে না ।
ময়ূরও নাচে না তাকে দু-নম্বরী সেলামী না দিলে ।

হাতুড়ির ঘায়ে না ফাটালে
রাজার ভাঁড়ার থেকে এক মুঠু খুদ খেতে
পায় না চড়ুই ।
স্বপ্নে যারা পেয়ে গেছে সচেতন ফাউন্টেন পেন
তাদেরও কলমে দেখ
সূর্য কীরণের মত কোনো কালি নেই ।
হে স্তন্যদায়িনী
তোমার দুধের মধ্যে এত জল কেন ?
তোমার দুধের মধ্যে প্রতিশ্রুত ভাস্কর্যের পাথর কেবল ।